بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ই অগাষ্ট, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী যখন পড়ি ও শুনি এতে তাঁদের পুণ্য প্রকৃতি, সত্য গ্রহণের জন্য উৎকণ্ঠা, প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য তাঁদেও বাসনা ও প্রচেষ্টা আর নিজ নিজ বোধ-বুদ্ধি, পছন্দ ও প্রবণতা অনুসারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁদের প্রেম এবং ভালবাসার উন্নত মান এবং উন্নত বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে। বস্তুতঃ এসব আখারীনরাই পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিজ নিজ পদ্ধতি এবং ভঙ্গিতে দায়িত্ব পালনে সোচ্চার জামাত। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রং এবং রীতি ছিল। যারা তাঁদের দেখেছে এবং যারা তাঁদের নিকটাত্মীয় ছিল তারা সাহাবীদের প্রতিটি রীতি ও ভঙ্গি এবং তাদের রীতি-নীতি থেকে নিজস্ব যোগ্যতা এবং সামর্থ অনুসারে শিখেছেন বা তাঁদের কোন কোন কথার ফলাফল বের করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রায় সব সাহাবীর সাথে বা যাদের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। সাহাবীদের বরাতে কথা বলে তিনি যখন কোন ফলাফল বের করে নসীহত করেন সেসব নসীহতের হৃদয়ে এক গভীর প্রভাবও পড়ে। অনেক সময় আমরা কোন ঘটনা হতে একটি কথা শিখি কিন্তু যখন ভাবা হয় তখন এর বিভিন্ন দিক সামনে আসে। একই ঘটনা বিভিন্ন ভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নসীহত হিসেবে কাজ দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহলমী সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাটি নিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে এটি বর্ণনা করেছেন তাঁর বয়আত সংক্রান্ত ঘটনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেবের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎও একটি মজার বিষয় ছিল। ‘তিনি বলেন, আমি কাদিয়ান আসি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন গুরুদাসপুরে তাই আমি সেখানে যাই। যে ঘরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন তার একদিকে ছিল বাগান। তাঁর বর্ণনা অনুসারে হামিদ আলী মরহুম দরজায় বসেছিলেন। মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, হামিদ আলী সাহেব আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি কিন্তু আমি সঙ্গোপনে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আর অতি সতর্কতার সাথে দরজা খুলে তাকালে দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পায়চারি করছিলেন আর খুব দ্রুত ও দীর্ঘ পদচারণা করছিলেন বা লম্বা লম্বা পা ফেলছিলেন। বন্ধুরা এই ঘটনা পূর্বেও কয়েবার শুনেছেন। হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, আমি দ্রুত পিছন দিকে মুখ

ফিরিয়ে নেই আর আমি নিশ্চিন্ত হই যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী। যে দ্রুত পায়চারি করছেন তাঁকে অবশ্যই সুদূর কোন গন্তব্যে পৌঁছতে হবে এ কারণেই দ্রুত হাঁটছেন। মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহলমী সাহেব ছিলেন ওহাবী। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ওহাবী হয়েও মৌলভী সাহেবের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা বড় বিস্ময়কর বিষয় ছিল। নতুবা সচরাচর এরা রুক্ষ ও কট্টরপন্থী মানুষ হয়ে থাকে।'

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা মৌলভী সাহেবকে সত্য দেখাতে চেয়েছেন। কোন কুরআনী যুক্তি-প্রমাণ দাবী করার কথাও তাঁর মনে পড়েনি আর হাদীসের কোন প্রমাণ চাওয়ার কথাও তিনি ভাবেন নি বা অন্য কোন প্রমাণ দাবী করার কথাও তার মাথায় আসেনি। ওহাবীরা কঠোরভাবে এই বিশ্বাসে বিশ্বস্ত যে, মহানবী (সা.)-এর পর ওহী ইলহামের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া তারা এটিও বলে, নাউযুবিল্লাহ্! নবী এবং ওলীদের আমাদের উপর কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব? নবীরা আমাদের এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের মতই। নবীও মানুষ আর ওলীরাও মানুষ। অনেকে হয়তো জানে না তাই আমি স্পষ্ট করার জন্য একথা বলছি; তাদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"নবীদের সত্তা এক প্রকার আধ্যাত্মিক বৃষ্টি হয়ে থাকে। তাঁরা উন্নত মানের আলোকিত ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন, বিভিন্ন গুণাবলীর সমাহার হন। তাঁদের সত্তায় কল্যাণ নিহিত থাকে। তাদেরকে নিজেদের মত সাধারণ মনে করা** (অর্থাৎ ওহাবীদের এমন মনে করা যে, তাঁরা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ) **অনেক বড় অন্যায়। নবী এবং ওলীদের ভালবাসার ফলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।"** এটি এক বিশেষ কথা যে, নবী এবং ওলীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

যাহোক হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব যেহেতু নেক ফিতরত এবং পুণ্য প্রকৃতির মানুষ তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্রুত পায়চারি করাকেই তিনি সত্যের প্রমাণ হিসেবে নিয়েছেন। খোদার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি মৌলভী সাহেবের ওপর পড়েছে, নতুবা পক্ষান্তরে এমন মানুষও আছে যারা প্রমাণ পেয়ে এবং নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না। অবশ্য এ কথা বলাও সঠিক নয় যে, সব ওহাবী কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। আফ্রিকায় সহস্র সহস্র ওহাবী এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেছেন। ওহী এবং ইলহামের যে সব সময়ই প্রয়োজন রয়েছে সেই উপলব্ধিও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আর তারা এটিও জানতে পেরেছেন যে, ওলী এবং নবীরা এক বারিধারার মত যাদের আগমনে পৃথিবী সতেজতায় ভরে যায়। তাই আধ্যাত্মিক সতেজতার জন্য ইলহাম অব্যাহত থাকাও আবশ্যক।

এরপর তিনি (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাসী সাহেবের নিষ্ঠা এবং ত্যাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার মাঝে প্রগাঢ় আন্তরিকতা ছিল, সবসময়

তবলীগে রত থাকতেন। তার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বড় বেদনার্তভাবে শোনাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই ঘটনা যখন আমার মনে পড়ে তখন তাঁর জন্য হৃদয়ে আমিও দোয়ার প্রেরণা পাই।প্রথম দিকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি তখন ধর্মের জন্য অনেক বেশি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতেন। তিনি প্রতি মাসে তিনশত, চারশত এমনকি পাঁচশত রূপী পর্যন্ত চাঁদা হিসেবে পাঠাতেন। খোদার লীলা এমন যে, তিনি কিছু ভুল সিদ্ধান্ত করেন অর্থাৎ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তের সময় তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কারণে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। তার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয়েছে যে,

قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنا دے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے

(অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করতে পারেন। আবার সুবিন্যস্ত কাজকেও তিনি অবিন্যস্ত করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য উদঘাটন করতে পারে না)

এই ইলহাম হওয়ার পর প্রথম পঙক্তির দিকেই দৃষ্টি যায় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করে দিতে পারেন- এর অর্থ এটি মনে করা হয়েছে যে, এখন শেঠ সাহেবের কাজ ঠিক যাবে বা তার ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠবে। আর দ্বিতীয় পঙক্তি অর্থাৎ সাজানো গোছানো কাজকেও তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য জানতে পারে না- সেই দিকে কারও দৃষ্টি যায়নি অর্থাৎ প্রথমে কাজ বা ব্যবসা লাভজনক হবে এবং এরপর আবার এতে ধ্বস নামবে। বরং সেটিকে সাধারণ অর্থে নেয়া হয়েছে। শেঠ সাহেবের ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়ার দু'তিন বছরে অবস্থা কিছুটা ভাল হয়ে যায়। এই ইলহাম হওয়ার পর ব্যবসা পুনরায় দাঁড়িয়ে যায়। অবস্থা ভাল হয়ে যায় কিন্তু এরপর পুনরায় ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয় আর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, অনেক সময় তার কাছে পানাহারের জন্যও কিছু থাকতো না। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অভাবনীয় ভালবাসার সাথে তাঁর উল্লেখ করে বলেন, শেঠ আব্দুর রহমান হাজী আল্লারাখ্খা সাহেবের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কতই না উন্নত মানের ছিল। কোন উপলক্ষে তিনি পাঁচশত রূপী পাঠিয়েছিলেন আর তা দেখেই তখন তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কোন বন্ধু তাঁর সমস্যা দেখে তাঁকে দু'তিন হাজার রূপী দিয়েছিলেন এই বলে যে, কোন ব্যবসা আরম্ভ করুন বা থালা-বাসনের দোকান খুলুন। এর থেকে পাঁচশত রূপী তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন, দীর্ঘদিন থেকে আমি কোন চাঁদা পাঠাতে পারিনি। এখন আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন তা থেকে আমি ধর্মের জন্য কিছু দিব না! এক কথায় ধর্মসেবার ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অনেক উন্নত মানের ছিল।

এরপর অপর এক জায়গায় তাঁর (রা.) আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আর্থিক কুরবানীর জন্য তাঁর হৃদয়ে কত আন্তরিকতা ছিল, কত আগ্রহ নিয়ে আর্থিক কুরবানী করতেন আর তা করতে না পারার কারণে কতটা ব্যাকুল হতেন এবং তাঁর অবস্থা কেমন হতো আর তিনি অন্যদের সামনে এর বহিঃপ্রকাশ কীভাবে করতেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন কয়েকজন বন্ধু তাঁকে সাহায্য করতো যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় তাঁর কাছে পানাহারেরও পয়সা থাকতো না। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামে এক অ-আহমদীর মানি অর্ডার আসে যাতে লেখা ছিল, শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব আমার আন্তরিক বন্ধু। আমি তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাল ধারণা রাখি এবং তাকে বুযূর্গ মনে করি ও তাঁকে ভালবাসি। একদিন আমি তাঁকে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পাই। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার কাছে যখন অর্থ ছিল তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে ধর্মের খিদমতের জন্য অর্থ পাঠাতাম কিন্তু এখন আর পাঠাতে পারছি না। তাঁর এই কথা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। আর তখনই আমি মানত করি যে, এখন থেকে প্রতি মাসে আমি আপনাকে দুই বা তিন শত রূপী করে পাঠাব। সেই অ-আহমদী তখন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অর্থ পাঠানো আরম্ভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার শেঠ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি মানি অর্ডার আসে যা হয়তো তিন বা চারশত টাকার মানি অর্ডার হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা দেখে বলেন, এই মানি অর্ডার শেঠ সাহেবের। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা তো বড় ভয়াবহ, এই টাকা কীভাবে পাঠালেন? পরে তাঁর (রা.) পত্র আসে যাতে লেখা ছিল, আমি কিছুটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা নেই। এরপর ভাবলাম, এর থেকে আপনাকেও কিছু পাঠিয়ে দেই। তাই কিছু টাকা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করেছি আর কিছু আপনাকে পাঠাচ্ছি। অতএব এই ছিল তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা এবং ত্যাগের প্রেরণা।

এরপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যে, কীভাবে তাঁর দাবীর পর অর্থাৎ তিনি যে, দাবী করেছেন যে, তিনি মসীহ্ মওউদ আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নবী এবং রসূলও আর মহানবী (সা.)-এর দাসত্বেই তিনি এই পদমর্যাদা পেয়েছেন, কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা গরীষ্ঠ শ্রেণী তাঁর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর আজ পর্যন্ত আমরা এই দৃশ্যই দেখি। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সব ধর্মকে চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর খ্রীষ্টান, হিন্দু সবাই তাঁর বিরোধী সারিতে অবস্থান নেয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লাঞ্ছিত করার সর্ব প্রকার হীন চেষ্টা করে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা

দায়ের করা হয়, এমনকি অনবরত তিন মাস সরকারী ছুটি ছাড়া প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁকে আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। একদিন ম্যাজিস্ট্রেট শত্রুতা বশতঃ তাঁকে (আ.) পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয়নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা আজ এসব কথা ভুলে গেছি। কিন্তু সে যুগের নিষ্ঠাবানদের জন্য এটি অনেক বড় একটি পরীক্ষা ছিল কেননা; একদিকে তারা খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনতেন যে, "বাদশাহ্ তোমার পোষাকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে আর তোমার অমান্যকারীরা পৃথিবীতে ইতর জাতির মতোই অবশিষ্ট থেকে যাবে" কিন্তু অপর দিকে তারা দেখতেন যে, চার-পাঁচশ রূপীর বেতনভোগী এক তুচ্ছ হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখে আর পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয় না। এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার মাথা ঘুরে যেত, মাথা এবং পা অবসন্ন হয়ে যেত। দুর্বল ঈমানের মানুষ হয়তো আশ্চর্য হতো যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে খোদার এত এত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এক কথায় এরূপ পরীক্ষাও ছিল। অনেকের জন্য এটি এ দৃষ্টিকোন থেকে পরীক্ষা ছিল যে, তিনি কত বড় দুর্বলতা বা অসহায়ত্বের সম্মুখীন? অনেকে মনে করতো, তাদের ঈমানের দাবী হলো, এমন বিরোধীদের হত্যা করা বা মেরে ফেলা, এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দৃশ্য আমার এখনও মনে আছে যেদিন এক মামলার শুনানীর দিন ধার্য ছিল। আমাদের জামাতের এক বন্ধু ছিলেন যাকে প্রফেসর বলা হত। তিনি যখন আহমদী ছিলেন না তখন ব্যাপক পরিসরে তাস ইত্যাদি খেলতেন অর্থাৎ জুয়া খেলতেন। ভালো এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন আর এভাবে তাস খেলে মাসিক চার পাঁচশ রূপী উপার্জন করতেন কিন্তু আহমদী হওয়ার পর এই কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আহমদীদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় উপদেশ। পূর্বে জুয়ার অভ্যাস থাকলেও আহমদীয়াত গ্রহণের পর তা ছেড়ে দিয়েছেন আর সামান্য একটি দোকান খুলে বসেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল আর এ কারণে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দারিদ্রের কষাঘাতকে মাথা পেতে নিতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তার আন্তরিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি লাহোরে গিয়ে একটি দোকান খুলেন। গ্রাহক আসলেই তাদেরকে তবলীগ করতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসতেন। গ্রাহক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তিনি ঝগড়া শুরু করে দিতেন। খাজা সাহেব অর্থাৎ খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এইমর্মে অভিযোগ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভালবাসার সাথে তাকে বলেন, প্রফেসর সাহেব! আমাদের জন্য নির্দেশ হলো নমনীয় হও, কোমল ব্যবহার কর, এটিই আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবিরত তাকে বুঝিয়ে চলেছেন আর একই সাথে প্রফেসর সাহেবের চেহারা রক্তিম হয়ে চলেছে। ভদ্রতা বশতঃ মাঝে তিনি কোন কথা বলেননি কিন্তু সবকিছু শুনে তিনি বলেন, এই নসীহত মানা আমার জন্য সম্ভব নয়। এরপর বলেন, আপনার পীর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কেউ যদি একটি অক্ষর বলে আপনি মুবাহিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, বড় বড়

বই লিখে ফেলেন; আর আমাদেরকে বলেন, কেউ আমাদের পীরকে গালি দিলে আমরা যেন চুপ করে থাকি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এটি অভদ্রতা ছিল কিন্তু এর মাধ্যমে তার ভালবাসার কথা অবশ্যই আঁচ করা যায় বা ধারণা করা যায়।

যাহোক যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দেয়ার কথা বা রায় ঘোষণার যখন সময় আসে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই তাঁকে শাস্তি দিবে আর কারাদন্ড দেয়াও অসম্ভব নয়। এদিকে জামাতের নিষ্ঠাবান আহমদীদের হৃদয়ে এক মূহুর্তের জন্যও এই ধারণা আসতে পারতো না যে, তাঁকে (আ.) গ্রেফতার করা হবে। সেদিন আদালতের পক্ষ থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিও ছিল ব্যাপক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আদালত কক্ষে যান তখন বন্ধুরা প্রফেসর সাহেবকে বাহিরেই থামিয়ে দেন কেননা তিনি রাগী মানুষ ছিলেন। প্রফেসর সাহেব একটি বড় পাথর একটি গাছের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক উন্মাদের মতো চিৎকার করে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই বৃক্ষের দিকে ছুটে যান এবং সেখান থেকে পাথর উঠিয়ে দ্রুততার সাথে আদালতের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকেন। জামাতের বন্ধুরা যদি পথে তাকে বাধা না দিতেন তাহলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা ফাটিয়ে দিতেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই তাঁকে শাস্তি দিবে আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

অতএব এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন মানুষের প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। অবস্থা কেমন ছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে, এমন অবস্থায় যারা দুর্বল ঈমানের মানুষ তারা মুরতাদ হয়ে যায়; আর যারা নিষ্ঠাবান তাদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। যারা প্রফেসর সাহেবের মতো অনেক বেশি আবেগ-প্রবণ, রাগী এবং ভিন্ন চিন্তাধারার অধিকারী তারা নিজেরাই প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং তরবীয়ত যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, আমাদের কর্মপন্থা, যা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত তাহলো, আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য এবং দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করতে হবে। আজও এমন ঘটনা অহরহ ঘটে। চূড়ান্ত পরিণতিতে ইনশাআল্লাহ্ তাই হবে যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আর ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে যারা কার্য সাধন করে তারা ইনশাআল্লাহ্ এমনটি হতে দেখবে।

কোন কোন 'দিন' সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করে থাকে যে, কিছু দিন শুভ আর কিছু দিন অশুভ। কোন দিন সফর কর আর কোন দিন সফর করো না। অনেকেই এ সম্পর্কে আমাকেও প্রশ্ন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রেফারেন্স অনেক সময় উপস্থাপন করা হয় বা হযরত আম্মাজানের রেফারেন্স উপস্থাপন করা হয়। হযরত আম্মাজানের রেফারেন্স এই ছিল যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, বুধবার বা অন্য কোন দিন তিনি আমাকে সফর করতে বাধা দিয়েছেন। এটি তাঁর কোন স্বপ্ন বা সন্দেহের কারণে ছিল, নতুবা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, আসলে কোন দিনের তো ভিন্ন কোন গুরুত্ব নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

প্রেক্ষাপটেও তিনি (রা.) একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কেউ একজন আমাকে বলে যে, আমি নাকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে কোন দিনকে অশুভ আখ্যায়িত করেছি। যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখেছেন তিনি বলেন, আপনিই তো কোন অনুষ্ঠানে বলেছেন, মঙ্গলবার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি কোন ইলহাম হয়েছিল বা অন্য কোন কারণে মসীহ্ মওউদ (আ.) মঙ্গলবারকে পছন্দ করতেন না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তো শুধু একটি রেওয়ায়েত বা একটি কথার ব্যাখ্যা করেছি মাত্র। আমি এ কথা বলিনি যে, মঙ্গলবার একটি অশুভ দিন। যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এমন একটি কথা আরোপ করা হয় তাই আমি বলেছিলাম, এই রেওয়ায়েতকে যদি সঠিক গণ্য করা হয় তাহলে হয়তো মঙ্গলবারকে তাঁর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় করা হয়েছে এজন্য যে, সেই দিন তাঁর মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এই বিশেষ কথা যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর (আ.) ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল এর পরিধি বিস্তৃত করে একে সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে এবং মঙ্গলবারকে অশুভ ধরে নিয়েছে অথচ যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে সেটিকে অশুভ আখ্যা দেয়া অনেক বড় নির্বুদ্ধিতার শামিল। বাকি থাকল সেই রেওয়ায়েত বা সেই কথা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়, তা যদি সঠিকও হয়ে থাকে তবুও সেই অশুভতা বলতে শুধু সেই বিষয়কেই বুঝায় অর্থাৎ তাঁর (আ.) মৃত্যু মঙ্গলবারে হওয়ার ছিল নতুবা যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সব দিনকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন আর সব দিনেই নিজ গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তখন এর মোকাবিলায় কোন রেওয়ায়েত বা ঘটনা যদি আমাদের সামনে আসে তাহলে আমরা বলবো, এই রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা রাবী ভুল করেছেন বা তার ভুল হয়েছে। আমরা এমন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে পারি না বা আমরা এটিই বলবো, সব মানুষের ক্ষেত্রেই মানবিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় হৃদয়ে কোন সন্দেহ দানা বাধতে পারে। অতএব মঙ্গলবারের কোন ভীতির কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝেও হয়তো এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি না যে, এই দিনটি অশুভ। এই রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে আমরা হয় বর্ণনাকারীকে মিথ্যাবাদী বলবো অথবা এটি বলবো যে, মানবিক দুর্বলতার অধীনে এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন সন্দেহ হয়েছে যে কারণে তিনি নিজের ক্ষেত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নতুবা মাসলা হিসেবে এটিই সত্য কথা আর এ কথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, সব দিন বরকতময় হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা দুর্ভাগ্যবশতঃ এক এক করে সব দিনকে অশুভ আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে আর এর ফলশ্রুতিতে তারা পূর্ণরূপে রাহুগ্রস্ত হয়েছে এবং পশ্চাদপদতার শিকার হয়েছে।

কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় বিনয় প্রদর্শন করে থাকে। এরও একটি মজার ঘটনা আছে। আর অনেকে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর অবস্থান নিয়ে থাকে। এরূপ স্বভাবের অধিকারী দু'ব্যক্তি এক জায়গায় সমবেত হয়। তাদের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর যুগে হাফেয মোহাম্মদ সাহেব নামে পেশাওয়ার নিবাসী এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগতাড়িত একজন আহমদী ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি আহলে হাদীস ছিলেন। কেননা তার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই কঠোর প্রকৃতির ছিল। একবার তিনি জলসায় আসেন এবং কাদিয়ান থেকে ফেরত যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খোদা ভীতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। কোন এক ব্যক্তি বলে বসে যে, খোদার মহিমা অনেক উঁচু, আমরা একেবারেই নীচ ও তুচ্ছ। জানিনা খোদা আমাদের নামায, রোযা এবং আমাদের যাকাত ও হজ্জ্ব গ্রহণ করেন কিনা? তখন অপর একজন বলেন, খোদা তা'লার মহিমা অত্যন্ত গরীয়ান, আমি তো অনেক সময় ভাবি যে, আমি আদৌ মু'মিন কিনা? পেশাওয়ার নিবাসী হাফেয মোহাম্মদ সাহেব এক কোনায় বসে ছিলেন। তিনি এসব কথা শুনতেই যে ব্যক্তি বলেছিলেন যে, জানিনা আমি মু'মিন কিনা? সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি নিজেকে কি মনে কর? তুমি কি মু'মিন হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রাখ? সেই ব্যক্তি বলে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, আমি মু'মিন কিনা? হাফেয সাহেব বলেন, আচ্ছা! যদি এই কথাই হয় তাহলে আজ থেকে আমি তোমার পিছনে নামাযই পড়ব না। অন্যরা বলল, হাফেয সাহেব! এর কথা সঠিক, ঈমানের মাকাম তো অতি উন্নত। তিনি বলেন, আচ্ছা তাহলে আজ থেকে আর তোমাদের কারও পিছনে আমি নামায পড়ব না। তোমরা যেহেতু নিজেদের মু'মিনই মনে কর না তাই তোমাদের পিছনে আমি কীভাবে নামায পড়তে পারি? বন্ধুরা পেশাওয়ার পৌঁছেন আর হাফেয সাহেব জামাতের সাথে নামায পড়া বন্ধ করে দেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, তোমরা যেহেতু নিজেদের মু'মিনই মনে কর না; তাই তোমাদের পিছনে আমি কীভাবে নামায পড়তে পারি? অবশেষে বিশৃঙ্খলা যখন অনেক বেড়ে যায় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হাফেয সাহেব ঠিকই বলেছেন, কিন্তু মানুষের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি ভুল করেছেন কেননা; তারা কুফরী করেনি কিন্তু তার কথাও সত্য। আমাদের জামাতের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক ছিল নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা। আর চেষ্টার যতটুকু সম্পর্ক আছে মানুষের উচিত নিজ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আর পুণ্যে উন্নতি করার চেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"মু'মিন হওয়ার কথা অস্বীকার করবে! এটি ভ্রান্ত রীতি"।**

পোষাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে আজকাল ইউরোপে গ্রীষ্মকালে সর্বত্র নগ্নতাই চোখে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা পোশাককে সৌন্দর্য বা যিনাত আখ্যায়িত করেছেন অথচ আমরা বর্তমান সমাজে দেখি যে, নগ্নতাকেই ফ্যাশান ধরে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে মানুষ এক্ষেত্রে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে, কোন স্থানে মুসলমান মেয়েদের একটি দল সাইকেল চালাচ্ছিল। সাইকেল চালাতে চালাতে গরম লাগলে তারা কাপড়ই খুলে ফেলে। এক কথায় এখন সেই যুগ এসে গেছে যখন চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা প্রকৃতিগতভাবেও শরীরের

কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখাকে অপছন্দনীয় মনে করা হয় না। এক যুগ এমনও ছিল যখন অন্ততঃপক্ষে নৈতিকতার দাবীর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং স্বভাবগত ভাবেই শরীরের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখাকে মানুষ অপছন্দনীয় মনে করতো, বিশেষভাবে মুসলমানদের মাঝে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে নগ্নতা হয়তো আজকের তুলনায় শতকরা ৭০ বা ৮০ ভাগ কম ছিল। কিন্তু সেই সময়কার একজন চিত্রকর যে ছবি আঁকতো বা পেইন্ট করতো তার বিবৃতি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তুলে ধরে বলেন, একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যাতে তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন করেছেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজকাল ইউরোপের মহিলাদের মাঝে বা নারীদের মাঝে প্রচলন হলো, তারা নিজেদের শরীরকে ক্রমশঃ উলঙ্গ করে চলেছে। যাহোক সেই প্রসিদ্ধ চিত্রকর লিখেন, 'চিত্রকর হিসেবে আমি পুরুষ এবং নারীদের নগ্নদেহ দেখে এতটা অভ্যস্ত যে, অন্যদের এতটা দেখার সুযোগ খুব কমই হয়ে থাকে। তাই আমি পেশায় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি, নগ্ন দেহ কোন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না বরং অনেক সময় এমন মহিলারা পুরুষের দৃষ্টিতে কুৎসিত গণ্য হয়। মহিলারা যদি তাদের দেহ এই কারণে উলঙ্গ রাখে যে, মানুষ তার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করবে তাহলে তাদের জানা উচিত, অনেক সময় প্রশংসার পরিবর্তে হৃদয়ে ঘৃণা জন্মে।' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি একজন দক্ষ পেশাজীবির মন্তব্য যে ইউরোপের বাসিন্দা। আর এই যে মতামত এটি খুবই মূল্যবান এবং যুক্তিযুক্ত একটি মতামত। একইভাবে পুরুষরাও অদ্ভুত সব আকৃতি ধারণ করে এবং পোশাক পরিধান করে। এরফলে তাদের গাম্ভীর্যও নষ্ট হয় আর অসৌন্দর্যও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু আজকাল স্বাধীনতার নামে চার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যদি কোন বাজে আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে সেই বাজে আচরণকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। যে কারণে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ নৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। আজ থেকে সত্তর বা আশি বছর পূর্বে এক চিত্রকরের সুচিন্তিত বিবৃতি এটি, আজকের কোন চিত্রকরও হয়তো এমন সৎ মতামত ও পরামর্শ দিবে না। শুধু চিত্রকরই নয় বরং কারও মাঝেই এই সৎসাহস নেই আর এই কারণেই নৈতিক অধঃপতন ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে আর নগ্নতাই সৌন্দর্যের মাপকাঠি গণ্য হচ্ছে। স্মরণ রাখা উচিত, নগ্নতা বা বাহ্যিক কোন আচার-আচরণ সৌন্দর্যের মাপকাঠি নয় বরং তা ভিন্ন বিষয়।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দু'জন সাহাবীর এক বিতর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের মাঝে পরস্পর এটি নিয়ে বিতর্ক হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, সৌন্দর্য চেনা বা শনাক্ত করা সহজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি সৌন্দর্যের সঠিক অনুমান বা ধারণা করতে পারে না। শুধু চিকিৎসকই চিনতে পারেন, কে সুন্দর আর কে কুৎসিত। কিন্তু মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন, এটি কোন কঠিন কোন কাজ নয়। প্রত্যেক চোখই বাহ্যিকভাবে দেখলেই সৌন্দর্য শনাক্ত

করতে পারে। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিঃসন্দেহে প্রত্যেক চোখ সৌন্দর্য শনাক্ত করতে পারে বা চিনতে পারে কিন্তু তার সেই চেনার মাঝে অনেক ভুল থেকে যেতে পারে। শুধু চিকিৎসকই বুঝতে পারেন, কে সত্যিকার অর্থে সুন্দর আর কে কেবল বাহ্যতঃ সুন্দর। এই আলোচনা চলাকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আপনার দৃষ্টিতে এখানে কোন সুদর্শন পুরুষ বা যুবক আছে কি? তিনি তখন এক যুবকের নাম উল্লেখ করেন যে দৈবক্রমে তখনই সেখানে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, আমার মতে এই যুবক সুন্দর এবং সুদর্শন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আপনার দৃষ্টিতে সে সুদর্শন এবং সুন্দর কিন্তু তার হাড়ে ত্রুটি আছে। চেহারা দেখেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাকে কাছে ডেকে বলেন, মিঞাঁ! তোমার জামা বা পোষাক একটু উপরে উঠাও তো। আর জামা সরাতেই তার বাকা হাড়ের এমন এক কুৎসিত চিত্র দৃশ্যমান হয় যে, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলে বসেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্, আমি তো জানতাম না যে, তার দেহের গঠনে এই ত্রুটি আছে। আমি তার চেহারা দেখেই তাকে সুদর্শন বা সুন্দর মনে করেছিলাম।

অতএব অনেক সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে ঠিকই কিন্তু ভেতরে সৌন্দর্য থাকে না। আল্লাহ্ যদি কিছু দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য পোশাক পরার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তা এজন্য দিয়েছেন যেন কিছুটা হলেও মানুষের সৌন্দর্য বজায় থাকে। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ তা থেকে দূরে সরে পড়ছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যার সেহরীর সময় সম্পর্কে নিজস্ব এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেভাবে পথের দিশা দিয়েছেন তাও অভিনব। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে মানুষ ফিলোসফার বা দার্শনিক বলতো। তিনি এখন প্রয়াত। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন। তিনি (রা.) বলেন, কথায় কথায় তার মাথায় কৌতুক আসতো যার কতক বড় উন্নত মানেরও হতো। তাকে দার্শনিক বা ফিলোসফার বলার কারণ হলো, সব কথায় তিনি একটি নতুন ব্যাখ্যা করতেন। একবার রোযা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সেই ব্যক্তি বলেন, মৌলভী বা ফিকাহ্বিদদের এটি অতি বাড়াবাড়ি যে, সেহরী যদি দেরীতে খাও তাহলে রোযা হয় না। যে ব্যক্তি বারো ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে যদি পাঁচ মিনিট পরে সেহরী খায় তাহলে অসুবিধা কী? মৌলভীরা ঝটপট ফতওয়া দিয়ে বসে যে, তার রোযা ভেঙ্গে যায়। এটি নিয়ে তিনি খুবই বিতর্ক করেন। পরদিন সকালে কিছুটা ভীত-ত্রস্ত হয়ে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছ আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেরই কথা এটি, কিন্তু যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ই দরস ইত্যাদি দিতেন তাই তাঁর বৈঠকেও অনেক মানুষ আসতো। সেই ব্যক্তি এসেই বলেন, আজ রাতে আমি অনেক বকাঝকা শুনেছি। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? তিনি বলেন, রাতে আমি তর্ক করেছিলাম যে, রোযাদার কিছুটা দেরীতে সেহরী খেলে রোযা হয়না বলে

মৌলভীরা বাড়াবাড়ি করছে। আমার মতামত ছিল যে ব্যক্তি বারো বা চৌদ্দ ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে পাঁচ মিনিট বিলম্বে সেহরী খেলে অসুবিধা কী? এই বিতর্কের পর আমি শুয়ে পড়ি। এরপর আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমরা তাঁত বুনছিলাম। ফিলোসফার বা দার্শনিক সাহেব তাঁতী ছিলেন। তাই স্বপ্নেও তিনি দেখেন যে, তারা কাপড় বানানোর জন্য সুতা বাধেন বা সুতা লাগান। তিনি বলেন, আমি উভয় দিকে খুঁটি গেড়েছি। আর সুতা প্রথমে এক খুঁটির সাথে বেধে দ্বিতীয় খুঁটির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন দ্বিতীয় খুঁটির কাছে পৌঁছলাম তখন খুঁটির দুই আঙ্গুল পূর্বেই সুতা শেষ হয়ে যায়। আমি সেটিকে খুঁটির সাথে বাধার জন্য বারবার টানছিলাম কিন্তু সফল হইনি। আমি ভাবলাম, আমার সকল সুতা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি হৈচৈ আরম্ভ করি যে, আমার সাহায্যের জন্য আস, দুই আঙ্গুলের জন্য আমার সুতা নষ্ট হচ্ছে এবং এই হট্টগোলের মাঝেই আমার চোখ খুলে যায়। জাগ্রত হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি, এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিষয়টি বুঝিয়েছেন, দুই আঙ্গুল সমান খালি জায়গার কারণে যদি সুতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোযায় পাঁচ মিনিট বিলম্বের কথা যে বলছো সেই পাঁচ মিনিট দেরীতে খাবার খেলে রোযা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

মানুষের ফিতরত বা প্রকৃতি হলো, সে একা বা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। কোন না কোন স্থানে তাকে সম্পর্ক গড়তে হয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক অধিবেশনে আলোচনা চলছিল, কেউ কি কখনও আটার রুটি খেয়েছে? সে যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ভুট্টা বা বাজরা বা বার্লির রুটি খেত। গম খুব কমই পাওয়া যেত। আর কারও কাছে গম থাকার সংবাদ পেলে শিখরা তা ছিনিয়ে নিত। সবাই বলে যে, আমরা গমের রুটি খাই নি শুধু এক ব্যক্তি বলে যে, আটার রুটি খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। অন্যরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কখনও আটার রুটি খেয়েছে? সে বলে, আমি খাই নি তবে একজনকে আটার রুটি খেতে দেখেছি। সে টাক মেরে মেরে বা খুব মজা করে খাচ্ছিল। এটি দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, আটার রুটি খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, অনেকেই খাবারের সৌখিন হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, অনেকেই মোরগের সৌখিন হয়ে থাকে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মুরগীর রান খুব পছন্দের ছিল, যিনি আমার শৈশবের বন্ধু। মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও তা খুব পছন্দ করতেন। আরেক বন্ধু যিনি মারা গেছেন তার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলতেন, কেউ যদি সারা জীবন মোরগের রান খেতে পায় তাহলে তার আর কি চাই? যাহোক মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার এটি পছন্দ নয় আর এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, তার দাঁতে কোন কষ্ট ছিল। তিনি বলেন, অনেক জিনিস এমন আছে যা অনেক মানুষ খুব পছন্দ করে। তারা যদি তা পায় তাহলে তারা বড় সৌভাগ্যবান। কিন্তু সেসব জিনিস বড় তুচ্ছ এবং নিম্ন মানের হয়ে থাকে। এছাড়া এসব জিনিস হস্তগত করার জন্য মানুষ আরও অনেক জিনিসের মুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে

আর আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা পেতে পারি তাহলে সুনিশ্চিতভাবে মানুষ বলতে পারে যে, এরপর আমার অন্য কারো মুখাপেক্ষীতার আর প্রয়োজন কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রায়শঃ পাঞ্জাবীতে এক সূফীর কথা বর্ণনা করতেন যে, **"হয় তুমি কারো আঁচল আঁকড়ে ধর বা কারো আঁচল যেন তোমাকে আবৃত করে"**। খোদা তা'লাকে পাওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উদাহারণ দিয়েছেন অর্থাৎ, এই পৃথিবীর জীবন বা ইহজীবন এমন যে, এখানে এছাড়া কোন গতি নেই, হয় তুমি কারো হয়ে যাও বা কেউ তোমার হয়ে যাক। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করার এটিই অর্থ। অর্থাৎ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ সে চাইলে কোন রূপ ধারণ করতে পারে, অর্থাৎ এটি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়, হয় সে কারও হয়ে যেতে চায় বা কাউকে আপন করে নিতে চায়। যেমন এক শিশুকেই নাও যার পুরোপুরি সচেতনতাও থাকে না কিন্তু কারো হয়ে যাওয়ার আগ্রহ তার মাঝে শুড়শুড়ি সৃষ্টি করে। সাবালক তো মানুষ অনেক পরে হয় কিন্তু অল্পবয়স্কা মেয়েদেরকেই দেখ, খেলতে গিয়ে তারা বলে, আমার পুতুল, তোমার পুতুল রাণী। এরপর আমাদের সমাজে শিশুরা তাদের পুতুলের সাথে পুতুল রাণীর বিয়ে দিয়ে থাকে। এরপর সব সমাজেই দেখা যায়, মেয়েরা তাদের মায়েদের অনুকরণে পুতুল রাণীকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর, তাদেরকে আদর করে আর যেভাবে মায়েরা মেয়েদেরকে দুধ পান করায় সেভাবে তারাও পুতুলকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে কেননা তাদের মন চায় যে, আমরা কারও হয়ে যাই বা কেউ আমাদের হয়ে যাক। একইভাবে ছেলেদেরকে দেখ! যতদিন বিয়ে হয় না ততদিন তারা মায়ের সাথে আঁকড়ে থাকে আর যখন বিয়ে করে তখন স্ত্রীর সাথে। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করতে গিয়ে বলেন, "خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ" অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিতে আমরা এই বৈশিষ্ট্য রেখেছি, সে কারও না কারও হয়ে জীবন কাটাতে চায়। এছাড়া সে স্বস্তি পায় না। আর কারও হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম উপায় যার ফলে ইহ এবং পরকাল উভয়টি সুনিশ্চিত হতে পারে তাহলো, মানুষের খোদার হয়ে যাওয়া এবং এ লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ভালবাসার মান এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যদিও দৃষ্টান্তটি এক পাগলের আর এমন এক পাগল ব্যক্তির যে ইহধাম ত্যাগ করেছে এবং যিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। যাহোক এর মাধ্যমে প্রেমের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। আমার এক শিক্ষক ছিলেন যিনি স্কুলে পড়াতেন। পরবর্তীতে তিনি নবুয়্যতের দাবীকারকও হয়ে বসেন। তার নাম ছিল মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার এমন ভালবাসা ছিল যে, এ কারণেই উন্মাদনা বা পাগলামী তার ওপর ভর করে। হয়তো পূর্বেও তার মাথায় কোন ত্রুটি ছিল কিন্তু আমরা এটিই দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসা বাড়তে বাড়তে তিনি পাগল হয়ে যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের প্রতি আরোপ করা আরম্ভ করেন। এরপর তার উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্নিকটবর্তী হওয়ার বাসনায় অনেক সময় এমন কাজ করে বসতেন যা অবৈধ এবং অসঙ্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নামাযেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র দেহে হাত বুলানোর চেষ্টা করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এই অবস্থা দেখে কিছু মানুষ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যেন যে দিনগুলিতে তার ওপর উন্মাদনার প্রকোপ হয় তখন তারা যেন দৃষ্টি রাখে, কোথাও সে যেন এসে তাঁর (আ.) পেছনে না বসে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর হাত তাঁর রানের দিকে এমনভাবে নিয়ে আসতেন যেভাবে কোন ব্যক্তি তার রানের উপর হাল্কাভাবে হাত মারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাত নাড়লে তখন মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব ভালবাসার আতিশয্যে তাৎক্ষণিকভাবে লাফ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছে যেতেন। আর কেউ যখন জিজ্ঞেস করতেন, মৌলভি সাহেব! আপনি এটি কি করলেন? তখন তিনি বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ইশারায় ডেকেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, এটি উন্মাদনা এবং গভীর ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ যে, তার দিকে কারও দৃষ্টি না পড়লেও বা কেউ যদি তার দিকে দৃষ্টি নাও দেয় তবুও প্রেমাস্পদের অজান্তে হাতের নড়াচড়া তাকে তাঁর দিকে ডাকার অর্থ করে। পক্ষান্তরে আমরা খোদা তা'লাকে ভালবাসার দাবী করি কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও যে, তোমরা নামাযের দিকে আস আর সফলতার দিকে ছুটে আস; আমরা নামাযের দিকে ছুটে যাই না আর জুমুআয় রীতিমত যাওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা নেই না।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট ডাকে সাড়া দিয়ে সেই প্রেমিকের মত ছুটে আসা উচিত এবং মসজিদ আবাদের চেষ্টা করা উচিত। আজকাল ছুটি রয়েছে। অনেক পিতা-মাতাও ছেলেমেয়েদের মসজিদে নিয়ে আসেন কিন্তু এরপর পুনরায় ধীরে ধীরে উপস্থিতি কমে যেতে থাকে, তাই আমি স্মরণ করাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের নামাযের হিফাযত করার এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।